॥ শিব ও তাঁহার অনুসঙ্গী ॥

শিব :—

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান দেবতা শিব। [illegible] মহাপ্রাচীন [illegible] শিবের [illegible] ছিল [illegible] সংহারক, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এই রকম [illegible] [illegible] ফ্যালিক [illegible] শিবের [illegible] হইতেও [illegible] অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না। [illegible] "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের [illegible] ক্রীড়িত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখরগুলি আমাদের আত্মার [illegible] ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।"

শৈব প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করিলেও শিবকে অবশ্যই কৃষি দেবতা হিসাবে ধরিতে হয়। শিবের বাহন [illegible] সহিত কৃষির সম্পর্ক [illegible] প্রজননের [illegible] উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। [illegible] প্রতীক। শিবের প্রধানতম প্রতীক লিঙ্গ। [illegible] শিবের লিঙ্গ পূজাই অধিকতর প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রকারদের বিধান। উত্তরবঙ্গের শিব মন্দিরগুলিতে, শিবের কোন মূর্তি থাকে না, পরিবর্তে গৌরীপট্টের উপর প্রোথিত লিঙ্গ পূজা হইয়া থাকে। লিঙ্গকে কেবলমাত্র যৌনাঙ্গের প্রতীক ভাবিলে চলে না। কৃষির উৎকর্ষ আবিষ্কারের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠতর যোগ থাকিতে পারে কেননা, "লিঙ্গ ও 'লাঙ্গল' দুটিই অস্ট্রিক শব্দ এবং উভয়ের মূল এক। আদিম যুগে লিঙ্গের মত একখণ্ডের পাথরের অস্ত্র মাটিখোঁড়া ও কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হত। ...[illegible] 'হল'." [illegible] লিঙ্গ [illegible]।" কাজেই [illegible] শিবকে কৃষি দেবতা রূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে।

উত্তরবঙ্গের [illegible] শৈব সাধনা [illegible] অনুমান [illegible] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় করিয়াছেন তাহা আমরা ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। [illegible] শিবকে কোচদেরই দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর, জটেশ্বর, মহেশ্বর, শীলেশ্বর, জল্পেশ্বর, কোচবিহার জেলার বাণেশ্বর প্রভৃতি মন্দির শিবের মন্দির বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। মন্দিরগুলির নামের দ্বারাই শিব পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত মহাকাল, মশানী, বুড়াবাবা, জগঠাকুর, মশান, বুড়াঠাকুর প্রভৃতি নামের শিব গ্রামদেবতারূপে পূজা পাইতেছেন। পূর্বোক্ত নামগুলির মধ্যে জল্পেশ্বর, শীলেশ্বর, বাণেশ্বর তিনটি মন্দির বাদে জটেশ্বর মহেশ্বর, জল্পেশ্বর মন্দির তিনটির ভগ্নরূপ এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম তিনটির পূজাকার্য ব্রাহ্মণ সম্পন্ন করিতেছেন এবং অন্যগুলিতে গ্রামঠাকুর পূজার সময় রাজবংশী অধিকারীই পূজা দিয়া থাকেন।

"জল্পেশ মন্দিরে নিয়মিত তিনবার পূজা হয়—প্রাতঃকালের পূজা, [illegible], মধ্যাহ্ন পূজা ও [illegible] এবং সায়ংকালীন আরতি। এখানকার ভোগের ব্যবস্থা প্রতিদিন [illegible] দ্বারা করা হয়। বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের মহাপীঠগুলিতে পূজা, [illegible], [illegible], ভোগ ইত্যাদি যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এখানেও সেই সমস্ত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। ...[illegible] দুধ, কলা, চিনি, সন্দেশ, বহু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বস্তু [illegible] হয়।"

জল্পেশ শিবের উদ্দেশ্যে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে রাজবংশী বালক [illegible] কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয় [illegible] একটি [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া হয়। [illegible] দুধের [illegible] পূজা [illegible] মন্দিরের [illegible] করিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] পূজা [illegible] সময় [illegible] না [illegible] কাটিয়া ফেলা হয়। [illegible] দুধ, চিনি, কলা, বাতাসা, আতপ চাউল প্রভৃতি উপকরণ দিয়া [illegible] পূজা হয়। বর্তমানে এই প্রথাটি [illegible] পাইতেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার শুকানের শীলেশ্বর মন্দির, কোচবিহার জেলার বাণেশ্বর মন্দির এবং [illegible] জেলার [illegible] মন্দিরে শিবপূজার সময়ে [illegible] নিবেদন করা হয়। [illegible] পূজা, [illegible] নিবেদন করা হয়। [illegible] নিবেদন [illegible]। [illegible] জল্পেশ্বর [illegible] উত্তরবঙ্গের [illegible] চলিত। [illegible] মাসাধিক কাল [illegible] হইতে [illegible] পূর্ণিমার সময় [illegible] একদিন মেলা বসিয়া থাকে। জটেশ্বর, মহেশ্বর ও জল্পেশ্বরের মন্দিরগুলি বিশেষ করিয়া এইগুলিতে নিত্যপূজার কোন ব্যবস্থা নাই। স্থানীয় জনসাধারণ মন্দিরগুলির সেবাকে গ্রামঠাকুর বলিয়া চালাইতেছে এবং বার্ষিক মেলার সময়ে পূজা দিয়া আসিতেছে। উত্তরবঙ্গের [illegible] মন্দিরে যে শিব এখন পূজা পাইতেছেন, তাঁহাকেও কিন্তু গ্রামঠাকুর ব্যতীত অন্য কিছু ভাবা যায় না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য আমরা এইরূপ অনুমান করিতেছি।

প্রথমতঃ, ময়নাগুড়ি থানার জল্পেশ গ্রামে জঙ্গলাকীর্ণ এক জায়গায় কতকগুলি পাথর ছিল। কোচবিহার রাজ্যের তদানীন্তন রাজা প্রাণ-নারায়ণ এতদঞ্চলে মৃগয়া করিতে আসিলে স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে একটি গাভী প্রতিদিন সেখানে দুগ্ধক্ষরণ করিয়া যায়। কৌতূহল বশতঃ তিনি সেখানকার পাথরগুলি সরাইয়া ফেলেন এবং একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। তাহাই বর্তমানের এই জল্পেশ লিঙ্গ।[৯] অথবা ঘটনা শুনিবার পর রাত্রিতে স্বপ্নে কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ স্থানে মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন।[১০] প্রাণ-নারায়ণ[১১] মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং তৎপুত্র মোদনারায়ণ তাহা সমাপ্ত করেন।[১২] জল্পেশ [illegible] লইয়া অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।[১৩] জনশ্রুতি জনশ্রুতিই, তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা আবিষ্কার এক অসাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই জনশ্রুতিটি সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন মন্দিরের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছিল। পরে অন্যান্য সাধারণ মন্দিরগুলির আবিষ্কারে যুক্ত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে জল্পেশমন্দির এক বিখ্যাত মন্দির, সুতরাং স্থানীয় [illegible] বিস্তৃতি সম্ভবতঃ এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই জন্ম লইয়াছেন। অথবা এই বিষয়টিকে যদি জনশ্রুতি বলিয়া ধরা

না হোকনা কইরাও পারে, তাহা হইলেও ইহা কিন্তু একটি বাস্তব সত্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে। এবং তাহা এইটি যে শিব একদা অনার্য দেবতা ছিলেন। রাজবংশীদিগের আদিপুরুষ আজঅবধি লোকালয় হইতে কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে পূজা পাইতেছেন। তাঁহার পাশে অনেকটি পাথর গাঁথিয়া রাখা আছে। এই পাথরগুলিকে আদিপুরুষের প্রতীক বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয় অতীত পূর্বকালে এই জাতির এক প্রধান আদিপুরুষ ছিলেন এবং পরে তাঁহাকে শিবের সঙ্গে সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলের সম্বন্ধে '[illegible]' গ্রন্থের মাধ্যমে একটি কথা প্রচলিত আছে। '[illegible] [illegible] বলিয়াছেন যে বিশ্বসিংহের মাতা জল্পেশের নিকট পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। পরে তিনি গর্ভবতী হন এবং যথাকালে শিশুর জন্ম হয়। এই শিশুই বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।' সুতরাং রাজবংশীদের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ, একাধিক কোচবিহার রাজা তথা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের জন্মের বহু পূর্বেই জল্পেশের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের মনে হয়, অতি প্রাচীনকালেই আদিপুরুষ হিসাবে জল্পেশের পরিচিতি ও প্রতিপত্তি ছিল এবং পরে শিবের সঙ্গে মিলিত হইলে উহার পূজায় ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল, ফলে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত [illegible] পূজার দায়িত্ব হইতে চ্যুত হইয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, ভারতের অন্যান্য দেবদেবীগণের ন্যায় এই অঞ্চলের শিবকেও শাস্ত্রীয়করণে আর্যীকৃত করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। আমাদের যুক্তির সমর্থনে যে তথ্যটি পেশ করা হইয়াছে তাহা হইল [illegible] একটি উপজাতির রীতি [illegible] শিবকেই এক অংশ বলিয়া মানিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিবমন্দিরে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, কিন্তু সরাসরি দেওয়া হয় না [illegible] সেটি আড়ালে বলি না দিয়া অন্য প্রক্রিয়ায় বলি করা হয়। এই সকল উদাহরণ হইতে মনে হয় যে আর্যীকরণের পূর্বে [illegible] অনার্য সমাজের অবদান বা অস্তিত্ব ভুলিয়া উঠিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, অনেক সময়ে কোন প্রতিপত্তিশালী 'সর্দার রাজবংশী' বা রাজার [illegible] অনুসারে এই ব্যক্তির নাম স্মরণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। সর্দার বা রাজা মারা গেলে ধারণা থাকে আসলে তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তাই মৃত্যুর পরে তাঁহাকে দেবতায় উন্নীত করা হইয়াছে। এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির দেবতায় রূপান্তরের দৃষ্টান্ত উত্তরবঙ্গে কম নহে। জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ী-ফালাকাটার ভুলকাটা ঠাকুর, কোচবিহার জেলার [illegible] গ্রামের [illegible] ঠাকুর, [illegible] জেলার মহাকাল ঠাকুর, জলপাইগুড়ির [illegible] সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রভৃতি দেবতা মানুষ হইতেই দেবতায় উন্নীত হইয়াছেন। এই সকল দেবতা প্রধানতঃ গ্রাম ঠাকুর পূজার সময় পূজা পাইয়া থাকেন। তাই জল্পেশও প্রাথমিক স্তরে এই জাতির একজন আদিদেবতা ছিলেন, পরে কোচবিহার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিবের সহিত একীভূত হইয়া উত্তরবঙ্গের প্রধানতম দেবতা বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ে শিব নানাবিধ নামে ও রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সাধারণতঃ মহাকাল, মাশান, মদনকাম, ধর্ম, [illegible], সন্ন্যাসী ও বুড়া প্রভৃতি দেবতাকে আমরা শিব বা তাঁহার অনুসঙ্গী হিসাবে একই তালিকাভুক্ত করিতেছি। পৃথক পৃথক আলোচনার সময় অনুমানের সমস্ত কারণ গুলিও যথাসম্ভব দেখানো হইবে।

মহাকাল :—

রাজবংশীদিগের ধারণায় মহাকাল হইলেন বন্য দেবতা, পর্বত বা বনাঞ্চলে তাঁহার আবাস এবং জঙ্গলের মাংসাশী পশুর নিয়ন্ত্রণকারক। বাঘ-ভালুক বা কোন হিংস্রজন্তুর সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলে মহাকাল ঠাকুরের শরণ লওয়া হয়। সুতরাং পশুযুক্ত জঙ্গলে এই দেবতাটির পূজা একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা লোকের বিশ্বাস ছিল যে মহাকালের পূজা না করিলে তিনি হিংস্র বাঘ-ভালুক পাঠাইয়া দিয়া মানুষ ও গবাদি পশুর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। প্রবোধ [illegible] মহাশয়ের মতে জলপাইগুড়ি জেলার [illegible] এবং কোচবিহারের [illegible] শিব ও মহাকাল। তাঁহার মতে [illegible] রাজবংশীদের [illegible] একটি মহাকাল মূর্তির বর্ণনা আছে। এই মূর্তিটি জাতীয় যাদুঘর, কলিকাতায় সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে মহাকাল ঠাকুরের একটি মন্দির আছে। সেখানে শিবলিঙ্গ, ত্রিশূল প্রভৃতি শৈব প্রতীক এবং শঙ্খ, [illegible] এবং এক জোড়া [illegible] পাদুকাও

রহিয়াছে। এখানকার নিত্যপূজায় পয়সা-কড়ি-দুধ-কলা-গাঁজা-পাঁঠা-হাঁস-পায়রা প্রভৃতি মানত করা হয়। পূর্বে এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে শূকর-মোরগ-ডিম প্রভৃতি উৎসর্গ করা হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইহাতেই বোঝা যায় যে আর্যেতর সমাজ হইতে পরবর্তীকালে দেবতাটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গৃহীত হইয়াছেন। মন্দিরের পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত দেউসি। এখন সেখানে নিম্নলিখিত মন্ত্রের সাহায্যে মহাকাল ঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে :—

"ওঁ মহাকালং যজেদ্দেবং দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ড-খট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতম্।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্।"১১

মনে হয় পূর্বে সেখানে এতদঞ্চলের আদিবাসীরাই পূজা দেওয়া হইত, সম্ভবত তাহাই মূর্তির সাহায্যে দেবতাটিকে আর্যায়িত করা হইয়াছে বা পুরাণাশ্রিত শিবের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য প্রয়াস করা হইয়াছে। যাহাই হউক, মন্দিরস্থিত ত্রিশূল-লিঙ্গ,পূজার অনুষ্ঠান উপচার দক্ষিণা, পাঁঠা প্রভৃতি এবং উক্ত মূর্তির প্রমাণে মহাকালকে মহাদেবের পর্যায়ে ফেলাইতে কোন অসুবিধা নাই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। "আদি-শিবের প্রথম মিশ্রণ লোকসমাজে উপাস্য এই মহাকালের সঙ্গে। মহাকাল শিব নামে ভূষিত হলেন, তন্ত্রশিবে মহাকালের রূপগুণ ও রক্তসিক্ত পূজাদি আরোপিত হল।... আসাম-উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মহাকালই শিব।"১২

মাশান :—

এই জেলার কালচিনি থানার অন্তর্গত গ্রামে রাজা ভাতিদ মধ্যে শিব চতুর্দশীর দিনে মহাকাল ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে। পূজায় কোনরূপ বলিদানের প্রথা নাই এবং কোনও মন্ত্র ব্যবহার হইতে দেখা যায় না।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে মাশান নামে এক দেবতার ব্যাপক পূজার প্রচলন আছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার বালাস এবং ইসলামপুর থানার রহমপুর গ্রামে সমারোহের সহিত মাশানের পূজা হয়। এতদঞ্চলে মাশানের বাহন সাধারণত: ঘোড়া। পূজার বিশেষ কোন মন্ত্র নাই, যজমান নিজেই দেবতার পূজাদানে অধিকারপ্রাপ্ত। ব্যক্তিগত শারীরিক এবং মানসিক পারিবারিক মঙ্গলার্থে সাধারণ কামনা-বাসনা পূজার কালে ব্যক্ত করা হয়। দুধ-পাঁঠা-পায়রা-হাঁস-ডিম-কলমূল প্রভৃতি উপচার হিসাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে। রহমপুর গ্রামে পূজার অন্তে প্রসাদ বিতরে একটি অভিনব প্রথা লক্ষিত হয়। বলি প্রদত্ত পায়রাটি আগুনে ঝলসাইয়া চাউলভাজার সহিত পূজায় অংশগ্রহণকারীরা খাইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গের অন্যত্র কোথাও এই প্রথাটির সাক্ষাৎ মিলে না। পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মাশান ঠাকুরের পাট দৃষ্ট হয়।

কোচবিহার জেলাতেও মাশান এক প্রধান দেবতা বিশেষ। দিনহাটা থানার আলোকঝাড়ি গ্রামে মাশানের একটি বিখ্যাত পাট রহিয়াছে। নিত্যপূজার ব্যবস্থা থাকিলেও মঙ্গল ও শনিবার এই দুইদিন বড় আকারে পূজা হয় এবং দূর দূরান্তর হইতে লোকের সমাগম হয়। বৈশাখ মাসের শেষের দিকে যে কোন মঙ্গল বা শনিবার বাৎসরিক পূজার ব্যবস্থা করা হয়। টিনের ঘরের মন্দিরে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মৃন্ময় মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, বাহন হাতী। মূর্তিটির দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম পার্শ্বে মাটির একটি শাল মাছ। মানত থাকিলে ভক্তগণ মৃন্ময় শূকর মূর্তি উপহার দেয়, সেগুলি ঘরের মধ্যে দেবতার পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হয়। নিত্যপূজায় ফুল ফল দুধ কলা চিনি এবং মানত থাকিলে কিংবা বার্ষিক পূজায় পাঁঠা পায়রা দিয়া পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায় বাহন শূকরের পৃষ্ঠে আসীন চতুর্ভুজ মাশানের পূজা হয়। এখানে পূজার উপকরণ প্রধানত: চিড়া ও দধি।

মাশানের পূজায় সাধারণভাবে কোন বিশেষ মন্ত্র দেখা যায়না। পূজা সমাপ্ত হইলে যজমান দেবতার নিকট সর্বমঙ্গলময় আশীর্বাদ ও তুষ্টি প্রার্থনা করে। কিন্তু উক্ত আলোকঝাড়ি গ্রামের মাশান ঠাকুরের পূজায় মন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং সেটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ :

"নমঃ কুবেরং ধনদং যক্ষং বিভূষণী ধনাসনং গদাধরং দেবং রক্তাক্ষমাত্রমুজ্জ্বলং সেবিতং।"১৩

পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে মাশানকে কুবের বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কুবেরের অন্য এক নাম যক্ষ। এই

দক্ষ হইতে উত্তরাপথের যথা ঠাকুরের উৎপত্তি। রাজবংশী সমাজের ধারণায় যথাঠাকুর শিব। সুতরাং কুবের এখানে শিব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন বলিয়া মনে হয়। আমরাও মাশানকে শিব বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। কারণ সাধারণ লোক মাশানকে শিব বলিয়াই মান্য ও মানত করে। উপরন্তু শব্দটি পর্যালোচনা করিলে আমাদের অনুমানটির কিছু গুরুত্ব হইতে পারে। শ্মশান-মশান একটি ধ্বন্যাত্মক প্রতিশব্দ। শ্মশানকে মশানও বলা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ মশানে যে দেবতা বিরাজ করেন সেই দেবতাই, পরবর্তীকালে মাশান হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্মশানচারী শিবই মাশানের মূলে রহিয়াছেন। পূর্বে হয়তো মাশানের পূজা শ্মশানে দেওয়া হইত, ক্রমে তাঁহার পূজার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে শ্মশান হইতে অন্যত্র স্থান বিশেষে পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।**

জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলার পশ্চিমাংশের মধ্যবর্তী [illegible] বিভিন্ন নাম ও প্রকৃতির মাশান পরিচিত হইয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গে তুলনায় চণ্ড মাশানের আকার প্রকৃতি মিলিয়া যায় না। এতদঞ্চলে মাশানের প্রধান পরিচয় উগ্র বা অপদেবতা হিসাবে। এই মাশানের সম্বন্ধে [illegible] একটি কৌতূহল-উদ্রেককারী [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] ঠাকুর [illegible] মাশানের কথা। [illegible] মাশান [illegible] বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। তাঁহাদের প্রচলিত একটি তালিকা দেওয়া যাইতে পারে।

১। বাড়ৈয়া মাশান—এই মাশান বাড়ীর নিকটবর্তী বাঁশবনে বা জঙ্গলে বাস করেন এবং বাড়ীর লোকের কোন দোষ পাইলে তাহাদের উপর ভর করেন।
২। শ্মশান্যা মাশান—শ্মশানে বাস করেন। শ্মশানে বা সন্ধ্যায় একাকী কাহাকেও পাইলে [illegible]।
৩। ঘাটিয়া মাশান—নদী বা পুকুরের ঘাটে ইহার আশ্রয় এবং প্রকৃতি [illegible] মাশানের মত।
৪। দুঁড়িয়া মাশান—বাড়ী হইতে দূরে মাঠে বাস করেন। ভর সন্ধ্যা, অধিক রাত্রি বা প্রখর দুপুরে পথচারীকে আক্রমণ করেন।
৫। চণ্ডাল মাশান—পথ পার্শ্বস্থ গাছে বাসকারী।
৬। বাঁশতা মাশান—[illegible] নষ্ট হইলে যে সকল [illegible] গাছ [illegible] বাঁশতা মাশান সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কেহ ভুলক্রমে সেই [illegible] না দিলে বা [illegible] করিলে তিনি ভর করেন।
৭। কাল মাশান—শ্মশানে ইঁহার বাস। ফলতঃ একাকী সন্ধ্যায় বা অধিক রাতে শ্মশানের নিকট দিয়া গেলে কাল মাশান বিপদ ডাকিয়া আনেন।
৮। কুহলীয়া মাশান—উত্তরবঙ্গে কোকিলের নাম কুহলী। অর্থাৎ যে মাশান গাছে বাস করেন এবং কোকিলের ন্যায় মিষ্টস্বরে লোককে বিভ্রান্ত করিয়া বিপদে ফেলেন।
৯। নাঙ্গা মাশান—সর্বদা উলঙ্গ থাকেন। ইঁহাকে দর্শন মাত্রই মানুষের মৃত্যু হয়।
১০। বিদুয়া মাশান—এই মাশান কোন ব্যক্তির উপর ভর করিলে তাহার সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়। ইনি যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান।
১১। ওদুয়া মাশান—এই মাশান ধরিলে মানুষ বমি করিতে থাকে। ইঁহার বাসের নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই।
১২। শুকনা মাশান—এই মাশান ক্ষীণকায়। লোককে ধরিলে তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষীণকায় করিয়া ফেলেন। বাসের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই।
১৩। ভুলা মাশান—রাত্রে ভুল পথে মানুষকে লইয়া যান। জনমানব-শূন্য মাঠে বাস করেন।
১৪। ডামশা মাশান—ঘন বনে বাস করেন। জঙ্গল ঘেরা বাড়ীর লোকগুলিকে আক্রমণ করেন অর্থাৎ আর্দ্র পরিবেশে সক্রিয়।
১৫। ছলিয়া মাশান—অর্থাৎ ছলিয়া নানাবিধ রূপ ধরিয়া রাত্রে মানুষকে বিভ্রাটে ফেলিয়া দেন।
১৬। ছলনার মাশান—মানুষকে নানা ছলে বিপদে ফেলেন। আঁকশা ও এই মাশানের বাস যত্রতত্র।
১৭। ন্যাড়া মাশান—এই মাশানের মস্তক মুণ্ডিত। নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নাই। মানুষের চরম শত্রু।
১৮। কলির মাশান—গ্রামের সর্বস্থানে বাস করিতে পারেন এবং অন্যান্য মাশানের চাইতে ইঁহারই প্রতিপত্তি ও মানুষের ক্ষতিকারক শক্তি বেশী।

ভণিতাটি হইতে আর কিছু না হউক একটি বিষয় পরিষ্কার হইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে মাশানগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং সেগুলি আর কিছু নহে বিশেষ বিশেষ রোগেরই ছদ্মনাম মাত্র বলা যায়। ডাক্তার ও আধুনিক ঔষধ পত্রের বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা যখন ছিল না তখন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোক সম্ভবতঃ এবম্প্রকারেই ব্যাধি ও তাহার কারণ নির্ণয় করিত তথা যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই মাশানগুলিকে উপদেবতা বা অপদেবতা মনে করা হইয়া থাকে। দিন ও রাত্রি যে কোন সময়ে ইঁহারা পুরুষ বা স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিতে পারেন। তবে নিঃঝুম দুপুর এবং ভর সন্ধ্যাতেই ইঁহাদের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কাহাকেও মাশান ধরিলে সাধারণভাবে এই উপসর্গগুলি দেখা যায়: আক্রান্ত ব্যক্তি তখন মাটি, কাঠ কয়লা, আধপোড়া জিনিষ খাইতে পছন্দ করে, রান্না করা জিনিষ তাহার ভাল লাগে না। রাতে 'বোবার' ঘুমন্ত অবস্থায় গোঙানি প্রলাপ করে এবং মাছ ধরিবার স্বপ্ন দেখিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। দিন দিন তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যায়, আমাশয়, রক্তক্ষয়, দুর্বলতা, স্বপ্নদোষ প্রভৃতিতে ভোগে। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পর রোগী অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়। মাশানের কোপদৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য দেওনিয়া ওঝাকে ডাকিতে হয়। ওঝা আসিয়া সরিষার বীজ লইয়া মন্ত্র সাহায্যে রোগীর দেহ হইতে মাশানকে দূরীভূত করিয়া থাকেন।

এযাবৎ দুই জাতীয় মাশানের সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারিলাম, এক জাতীয় মাশান পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ও হেমতাবাদ এবং কোচবিহারের দিনহাটা থানায়, দ্বিতীয় প্রকারের মাশান কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-মেখলীগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় প্রাপ্ত। আপাতঃ সাদৃশ্য না থাকিলেও ইঁহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তরবঙ্গ এক সময় বনাঞ্চলে আবৃত ছিল, ফলে পথে-ঘাটে-বনে-বাদাড়ে হিংস্র জীবজন্তু ছাড়াও ভূত প্রেত অপদেবতা উপদেবতারও প্রকোপ ছিল। এই সবের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণের ব্যাপারে ডাক্তার বৈদ্যের চাইতে স্থানীয় ওঝা-কবিরাজের উপর গ্রামবাসীরা নির্ভর করিত বলিয়া মনে হয়। লোকালয়গুলির মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষ শ্মশান, বসতি বিরল মাঠ, বন জঙ্গলে অন্ধকার প্রায় পথ-ঘাট প্রভৃতি মানুষের ভীতি উদ্রেকের কারণ হইত। গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ মানুষ নির্জন দুপুরে, ভর সন্ধ্যায় এবং অধিক রাতে ঐসব জায়গাগুলিতে চলাফেরা করিতে সাহস পায় না। কেননা এই সময়ে উপদেবতা অপদেবতারা ঐ সব স্থলে চলাফেরা করে বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে। মনে হয় শ্মশানচারী উপদেবতা মাশান লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া অত্যাচার করিয়া পূজা আদায় করিতেন। ক্রমশঃ ইঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিলে পরবর্তীকালে মাশানকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় এবং প্রথমটির মধ্যে কৌলিন্য প্রাপ্তির পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু শ্মশানচারী বলিয়া মহাশ্মশানী শিবের সহিত প্রাথমিক পর্যায়েই ইঁহার আত্মীয়তা বা অভিন্নতা সৃষ্টি হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

মদনকাম :—

শিব ও তাঁহার অনুষঙ্গীর তালিকায় আর একটি দেবতাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করিতেছি, নাম মদনকাম ঠাকুর। রাজবংশীদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এই মদনকামের দুইরূপ, একটি হইল শুধু মদনকাম, অন্যটি বুড়া মদনকাম ঠাকুর। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে মদনকামার নামে এক দেবতাকে পাওয়া যায়। ইঁহাও মদনকাম ঠাকুরেরই স্বল্প পরিবর্তিত নাম বলিতে হয়। কেননা মদনকামের প্রতীক বাঁশ এবং তাঁহা শিবলিঙ্গ হিসাবে সাজানো থাকে, মদনকামারেরও প্রতীক বাঁশ এবং তাঁহাকেও শিব ঠাকুরের অংশ বলিয়া ওখানকার রাজবংশীরা ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত রংপুর ও পূর্ব-দিনাজপুর জেলাতেও এই জাতীয় দেবতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম মদন কুমার। ইঁহারও প্রতীক বাঁশ, সুতরাং তাঁহাকেও মদনকাম ঠাকুরই বলিতে হয়।

দেবতাটির নামের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল বলা মুস্কিল। কোচবিহার রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন এবং তাঁহার মন্দির কোচবিহার জেলার সর্বত্র রহিয়াছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় অংশ একদা এই রাজ্যের মধ্যে ছিল। ফলতঃ রাজকুলের দেবতার পক্ষে সাধারণো পূজা পাওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু মদনমোহনের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক কখন বা কিভাবে গড়িয়া উঠিল তাহা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। রতির স্বামী কামদেবের এক নাম মদন অর্থাৎ মদনও যিনি কামদেবও তিনি। এই মদনকে শিব ভস্ম করিয়াছিলেন। মদন বা কামকে ভস্মকারী শিবই মদনকাম হইয়াছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়

যেহেতু মদনকামকে হিন্দুরা পূজা করে এবং তাঁহার প্রতীক বাঁশগুলিকে পবিত্র বলিয়া মান্য করে সেইহেতু মদনকাম ঠাকুরকে মদনমোহনকারী পীর বলিয়াই সাধারণ করিতে হয়।

মদনকাম ঠাকুরের পূজা এবং বাঁশ খেলার পূজা সমার্থক। কিংবা মদনকাম ঠাকুরের সহিত যে বাঁশ খেলার গান বলিয়া সর্বত্র শাখা আছে তাহাই মদনকাম ঠাকুরের পূজা হইতে বাঁশ খেলার পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কোচবিহার, দার্জিলিং জেলায় মদনকাম ও মদনকুমার ঠাকুরের পূজা জলপাইগুড়ি জেলায় বাঁশ খেলার পূজা কথাগুলি ব্যবহৃত হয়।

মদনকাম পূজার প্রধান অঙ্গ বাঁশ। ৫টি বা ৭টি বাঁশ লাল সাদা কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া মাথায় চামর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাঁশগুলির নিম্নভাগে মাটিতে বেদী তৈয়ারী করিয়া পূজা দেওয়া হয়। চাউলের গুঁড়া ও কলার গুঁড়ার সাথে গুড় মিশাইয়া নাড়ু তৈয়ার করা হয়। এই নাড়ু ঘোড়া, পান-সুপারি, দুধ-দুধকলা, দই-কলা প্রভৃতি কলার ছোট ছোট খোলে বা পাতায় নৈবেদ্য সাজাইয়া বেদীতে দেওয়া হয়। মানত থাকিলে পাঁঠা বা পায়রা বলি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বুড়া মদনকাম ঠাকুরের বেলাতে এইরূপ বলিদানের কোন প্রথা নাই। তদুপরি পুং-বিনাশপুরের এই পূজায় স্ত্রীলোকেরা আতপ চাউল ও দুধের ভোগ দিয়া থাকে। সব অঞ্চলের পুরোহিত রাজবংশী সমাজের অধিকারী।

মদন ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কোথাও কোথাও মদনকামের উৎসব হইয়া থাকে। বাঁশগুলি লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গাহিয়া টাকা পয়সা চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মাত্র ১ দিনের এই উৎসব পালিত হইয়া থাকে। কোচবিহার অঞ্চলে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে বাঁশগুলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রোথিত করিয়া উহার চারিদিকে ১০০ পাক ঘুরিয়া চামর ও কাপড় খুলিয়া লইয়া বাঁশগুলি নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এক দিনের অনুষ্ঠানের শেষ সময়ে কালীর পূজা করিতে দেখা যায়।

মদনকামের যে ৫টি বা ৭টি বাঁশ ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিভিন্ন দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত, কিংবা এক একটি বাঁশ এক একজন দেবতার প্রতীক হিসাবে লোকে ধারণা করে। জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার্স (অর্থাৎ ডুয়ার্স অঞ্চলে), দার্জিলিং জেলার তরাই এবং কোচবিহার জেলার সর্বত্র যে পাঁচটি বাঁশ দেওয়া হয় সেগুলি এই সকল দেবতার নামে: (১) সন্ন্যাসী, (২) কালী, (৩) বনচান, (৪) বন্দক ও (৫) মাদারপীর। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পশ্চিমাংশে সাতজন দেবতার নামে ৭টি বাঁশ দেওয়া হয়, যথা (১) গঙ্গামতী, (২) গুরুনাম, (৩) সন্ন্যাসী, (৪) কালী, (৫) তিস্তাবুড়ী, (৬) বিষহরি, এবং (৭) মাদারপীর। দেখা যাইতেছে সন্ন্যাসী, কালী ও মাদারপীর উভয় স্থলেই পূজা পাইয়া থাকেন। সন্ন্যাসী, কালীর সহিত মুসলমান সমাজের দেবতা মাদারপীর কিভাবে পূজা পাইলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। "মাদারী ফকীর বলিয়া এক শ্রেণীর ফকীরের দল বঙ্গদেশে প্রায় সর্বত্র রহিয়াছে।...তাহারা একটি বাঁশকে নানাভাবে সুসজ্জিত করিয়া তাহা লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া গান করে।...এই বাঁশকে মাদারের বাঁশ বলে"।'' বগুড়া জেলায় বাঁশ লইয়া মুসলমান সমাজে যে পূজা উৎসবের প্রথা আছে তাহাতেও ৫টি বাঁশ থাকে এবং উৎসবান্তে হিন্দু রাজবংশীদের মত করিয়া বাঁশগুলিকে কাপড় দিয়া সুসজ্জিত করা হয়। যে দেবতাদের নামে বাঁশগুলি থাকে তাহারা হইলেন (১) গাজীমিঞা, (২) হাজীপা সাহেব, (৩) বিবি, (৪) শাহ মাদার এবং (৫) বড় মাদার।'' সুতরাং হিন্দু রাজবংশী ও মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ে এই পূজা বা উৎসবটির অস্তিত্ব লক্ষ করা যাইতেছে। বস্তুতঃ আমরা মনে করি মুসলমান সমাজ হইতেই ইহা রাজবংশীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কেননা, মুসলমান সমাজের বাঁশগুলি কোন হিন্দু দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত নহে, অথচ রাজবংশীদের মদনকাম ঠাকুরের বাঁশগুলি, অন্ততঃ ১টি মুসলমান পীরের নামে দেওয়া।

বাঁশগুলি লইয়া গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বেড়াইবার পূর্বে 'বাঁশ জাগানো' অর্থাৎ বাঁশ জাগ্রত করণের জন্য পূজা করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় শেষ অনুষ্ঠানে যে কালী ঠাকুরের পূজা করা হইয়া থাকে উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কলেরা ইত্যাদি রোগের মহামারী হইতে পরিত্রাণ লাভ।'' মুসলমান সমাজেও এই ধারণাটি প্রবল। "আমরা নলা ডাকার কথা জানি। যতদূর মনে হইতেছে মাদারের বাঁশ কলেরা প্রভৃতির আক্রমণে কিংবা বিশেষ মানসিক করিয়া মাদারের বাঁশ দেখাইয়া রাত্রির বেলা সকলে একত্র হইয়া ভ্রমণ করে বা নলা ডাকে।...নলা শব্দটি সম্ভবতঃ ফারসী নালিদান (অর্থ ক্রন্দন করা) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।...নলা গান বাংলাদেশের কোথাও কোথাও এখনও দেখা যায়।''' গান গাহিয়া চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ কালে যে রূপ দেওয়া তাহার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণের বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে জীবন্ত।

'বৃক্ষোপাসনা' অধ্যায়ে এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে যে এই মহারাজ প্রাথমিক স্তরে বৃক্ষপূজাই ছিল। পরে ইহার সহিত সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণের বিশ্বাস এবং তাহারও পরে এককালে শিব প্রাধান্যের দেবতা হইয়া উঠিলে ক্রমটি শিবের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ :—

মহারাজ নামক দেবতাটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী ও অন্যান্য প্রাচীন সমাজের নিকট হইতে বিশেষ সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় দেবতাগুলি হইতে ইঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কোন অংশে কম নহে। এই দুই জেলায় বৈশাখ মাস পরে [illegible] মাসের যে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে এই দেবতার পূজা দেওয়া হয়। পূজার [illegible] গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া নির্বাহ করে। অন্যান্য দেবতাদের ন্যায় মহারাজের পূজাতেও [illegible] উপকরণ প্রয়োজন। মানত থাকিলে পূজার শেষে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ [illegible] সংস্কৃতি বহন করে। কাজেই সেখানে অন্য বর্ণের প্রভাব রাজবংশী সমাজে পড়িতে পারে। সেইজন্য অধুনা কিছু কিছু অঞ্চলে মহারাজ ঠাকুরের পূজা ব্রাহ্মণ সম্পন্ন করিতেছেন। তথাপি মালদহের উত্তরাংশ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় মহারাজের পূজা রাজবংশীদিগের নিজস্ব পুরোহিত [illegible] নির্বাহ করিয়া থাকেন।

মাটির মূর্তি গড়াইয়া এই দেবতার পূজা দেওয়া হয়। মূর্তির বেশে রাজকীয় পরিচ্ছদ, [illegible]। বাহন হস্তী, [illegible] মহারাজ [illegible] একটি মূর্তির থাকে। দেবতার এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অনায়াসেই কেহ ইঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে বাংলার লোকসংস্কৃতির [illegible] অভিমত হইতেছে—"ইন্দ্রপূজা শাস্ত্রীয় পূজা, ইহা লৌকিক পূজা নহে। শাস্ত্রীয় পূজা মাত্রই বাংলাদেশের সর্বত্র থাকিবার কথা, কেবলমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহে প্রচলিত থাকিবার কথা নহে। বাংলাদেশের আর কোথাও দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত নাই। সুতরাং ইহা আর যা কোন [illegible] পূজা নহে।" মহারাজের সহিত অশ্বারূঢ় মূর্তিটিকে বিভীষণ অনুমান করিলে কেহ ইঁহাকে [illegible] বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য মহাশয় সেটির অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে "বিভীষণ রামভক্ত সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্র না থাকিয়া, বিশেষতঃ সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমানকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র বিভীষণকে কল্পনা করা যায়না।" বিষয়টিকে তিনি পরিবেশের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকার আধারে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে গৌড়ের হিন্দুরাজা গণেশের পূজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মধ্যযুগের নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনের মধ্যে স্বাধীন ও পরাক্রমী রাজা হিসাবে একমাত্র গণেশই ব্যতিক্রম। রাজভক্ত প্রজাসাধারণ গণেশ মহারাজের পূজা করিয়াছে এবং পরবর্তীকালে রাজা গণেশের পরিবর্তে সংক্ষেপে মহারাজ শব্দটি লোক সমাজে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অনুমান।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভকাল হইতে রাজা গণেশ গৌড়বঙ্গের একাধিপতি। তাই মৃত্যুর পরে প্রজাবৎসল রাজা গণেশের পূজা প্রাপ্তির ঘটনাটি অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু মালদহ—পশ্চিম দিনাজপুরের মহারাজ ঠাকুরের পূজার সহিত উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের পূজার মধ্যে খুব নিবিড় কোন সম্পর্ক না থাকিতেও পারে।

মালদহ—পশ্চিম দিনাজপুর বাদে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সদর থানার অন্তর্গত [illegible] পাকিস্তানের সীমান্ত সন্নিকট দেবধাড়ী অঞ্চলের বোদাপাড়া নামক গ্রামে মহারাজ ঠাকুরের একটি থান আছে। থানে সর্বমোট ৪/৫টি মৃন্ময়মূর্তি রহিয়াছে। মূর্তিগুলির বর্তমান চেহারা হইতে ইহাদের সম্পর্কে কোন কিছুই কল্পনা করিতে পারা যায় না। ইহাদের একটি মহারাজ ঠাকুর নামে পরিচিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গ্রামবাসীর ধারণা ও বিশ্বাস মতে মহারাজ একজন গ্রামঠাকুর তথা শিব।

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ধান রোপণের পূর্বে গ্রামঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পূজা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অথবা আষাঢ় মাসের আরম্ভে করা হয়। মহারাজ গ্রামঠাকুর বলিয়া ইঁহারও পূজা এই সময়ে সাধারণভাবে হইয়া থাকে। পূজার যে সকল দ্রব্যের দরকার হয় সেগুলি হইল—দই, চিড়া, খই, মুড়কী, দুধ, চিনি, ধূপ, ধুনা, মৃত্তিকা, আটা বা আতপচাউলের পিঠা, ঘি, মধু, সরিষা, চাউল, চিড়াভাজা,

কলা, নূতন গামছা, মাটির প্রদীপ, বেল-তুলসী পাতা, জবাফুল ও সময়োচিত ফলমূল, [illegible] ঠাকুরের জন্য কলকী, গাঁজা, আড়, নূতন ধুতি। এই পূজায় মহারাজ ব্যতীত বিষহরী, কালী, শালগ্রাম প্রভৃতি দেবতারও পূজা হয় এবং বিষহরী ও শালগ্রামের জন্য লালপাড় নূতন শাড়ী ও গামছা দিতে হয়। মানত থাকিলে মহারাজ ঠাকুরের জন্য পাঁঠা ও কালীর জন্য পায়রা বলি দেওয়া হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার শ্যামাপূজার সময়েও এই থানে পূজা দেওয়া হয়। তখন কালীকে পাঁঠা ও মহারাজকে পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই সময় ছাড়াও মানত থাকিলে বৎসরের যে কোন সময় মহারাজ ঠাকুরের পূজা হইতে পারে।

[illegible] মহারাজকে [illegible] পূজা দিলেও বিশেষতঃ নামঘর [illegible] [illegible] এক বিশেষ [illegible] [illegible] অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

[illegible] উত্তরবঙ্গের [illegible] বর্তমানে [illegible] ছিল। কিন্তু গড়ের স্থানীয় নামও পৃথু রাজার গড়। "ইহাতে [illegible] এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলে [illegible] [illegible] 'মহারাজ দীঘি' নামে পরিচিত [illegible] [illegible] নামক রাজার [illegible] [illegible] কিন্তু গড় এখন [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] মহারাজ ঠাকুরের [illegible] [illegible] এখানকার দেবতাটির সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] সুতরাং উক্ত স্থানের [illegible] [illegible] নিকট হইতে [illegible] পারেন।

[illegible] প্রকৃত প্রস্তাবে এই মহারাজ ঠাকুরই [illegible] [illegible] মহারাজের পূজাকে 'শিবপূজারই নামান্তর বলিয়াছেন। [illegible] মধ্যে মহারাজা নামক এক দেবতার পূজা হইয়া থাকে। [illegible] স্থানীয় কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারীভাবে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এই মহারাজার আশীর্বাদেই তাহারা কৃষিকার্যে সুফল লাভ করিতে পারে। [illegible] উক্ত ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ইঁহার মহারাজ নামকরণ বহু পরবর্তী। মনে হয় এই অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির পর স্থানীয় কৃষকদিগের উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা (Fertility god) কোন কোন স্থানে মহারাজা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ব্যাপকভাবে শিব বলিয়াই পরিচিত হইতে থাকেন। আমরাও এই অভিমতটিকে সমর্থন করিতে চাই। রাজবংশী কৃষকদের গ্রামঠাকুর-জাতীয় দেবতা উত্তরকালে শৈবধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইলে শিবের সহিত একীভূত হইয়া যান এবং তাহার পরে স্থানীয় রাজার [illegible] সঙ্গে জড়িত হইয়া মহারাজ ঠাকুর নামে ভূষিত হন।

যথা :—

কোচবিহার জেলায় রাজবংশীদের মধ্যে বথা নামে এক দেবতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের অন্য কোন জেলায় ইঁহার পূজার প্রচলন থাকিতে দেখা যায় না। এই জেলার দিনহাটা মহকুমার [illegible] গ্রামে "চৈতার চড়া" বিলের ধারে বথা ঠাকুরের একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে ছইটি মৃন্ময় মূর্তি আছে, একটি বথার, অন্যটি তাঁহার স্ত্রী বথানীর। প্রতি বৎসর নূতন মূর্তি গড়াইয়া বথা-বথানীর পূজা দেওয়া হয় এখানে। বথার মূর্তিটি দ্বিভুজ, ব্যাঘ্রাম্বর, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, মাথায় বৃহৎ জটা এবং ছইটি উদ্ধত ফণা সর্প মাথাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার বাম পার্শ্বে বথানী সর্বালঙ্কার ভূষিতা [illegible] একটি নারীমূর্তি। [illegible] [illegible] হইতে বথা নামটি [illegible] শব্দ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইতোপূর্বে মাশান দেবের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে মাশানকে কুবের নামে ধ্যান করা হইয়াছে। আবার কুবেরেরই নাম যক্ষ। সুতরাং মাশানকে শিব সাব্যস্ত করিলে বথাকেও তাহাই করিতে হয়। স্থানীয় লোক বথাকে শিব বলিয়াই বিশ্বাস ও পূজা করে। মূর্তিটিকেও শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা কল্পনা করা যাইতে পারেনা।

অর্থাৎ বদা ঠাকুরকে শিবের এক লৌকিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অথবা বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও বিচার করা চলিতে পারে। সাঁওতালের পূজায় ভূতেরও স্থান খুব আছে। বদ হইতে বদা নামের উৎপত্তি,—এই দুইটি দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অন্য এক সম্ভাব্য অনুমানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারে। অন্যটা কিন্তু কখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার অশরীরি আত্মা অপদেবতা হইয়া থাকিতে পারে এমন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস এখনও প্রবল। কিন্তু বেলার এই আত্মার অপদেবতার ন্যায় ভয়ভয় এবং মুসলমানের ক্ষেত্রে ভয় ছিল। বস্তুত বদের দেবতা, অতএব ভূত-শিবেরই পরিচায়ক। সম্পদ সংরক্ষণ ও ধনবৃদ্ধির কামনা বাসনা হইতেই সম্ভবতঃ বদার পূজা আরম্ভ হইয়া পরবর্তীকালে শিবের সঙ্গে দেবতাটি একীভূত হইয়াছেন। ফলে বদার মূর্তি শিবেরই মূর্তি।

বদার পূজা সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসে হয়। গ্রাম হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হইয়া থাকে। কাঁচা কলা অর্থাৎ বাঁচি কলা, দুধ, দই, চিনি, খাজা ইত্যাদি উপচারে বদার পূজা হয়। মানত থাকিলে পাঁঠা, পায়রাও বলি দেওয়া চলে। বলি প্রদত্ত পাঁঠা ও পায়রার মাংস ও ভাত রান্না করিয়া সমবেত লোকদের পূজার শেষে খাওয়ান হয়। রাজবংশীদিগের নিজস্ব সামাজিক পুরোহিত অধিকারী বা ভাটোয়া-দিই বদার যে কোন পূজা দিতে পারেন। পূজায় কোন মন্ত্র ব্যবহার হয় না। উপচারসহ দেবতার নিকট নিবেদন করিয়া সুখ-শান্তি পাইবার কামনা জানান হয়। আবার "ভবাকোলা বাঁধ হইতে নিরাপদ হলের জন্যই কলা-ভকিনীর পূজা দেওয়া হয়।"[১১] গাভী বাচ্চা প্রসব করিলে প্রথম বারের দুধ দোহন করিয়া দই তৈয়ারী করিয়া বদা ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করিবার প্রথা কোচবিহারে সবিশেষ প্রচলিত। কেননা লোকের বিশ্বাস এই দেবতা দই খুব পছন্দ করেন। বাছুর ও গাভী অসুখ হইলে বদা ঠাকুরকে বাঁচিকলা ও কাল দই দিয়া পূজা করিলে খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া যায়। সুতরাং বদা একটি দেবতা শিবের সহিত সংযুক্ত হইবার ফলে তাঁহারই রূপ সর্বমঙ্গলপ্রদ দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। আবার শিবের মতই তাঁহার অন্য একটি অশুভকর প্রলয়কার রূপটির [illegible]। পাপের নিকট দিয়া যাইবার কালে যথাযোগ্য ভক্তি না জানাইলে বদা রুষ্ট হন এবং অবজ্ঞাকারীর অনিষ্ট সাধনে তৎপর হন। বাঁচিকলা ও দই দিয়া পূজা দান করিলে অবশ্য অতি শীঘ্র তিনি তাঁহার রোষ সম্বরণ করেন বলিয়া স্থানীয় লোকের প্রবল বিশ্বাস আছে।

সন্ন্যাসী :—

আমরা ভূমিকায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছি যে মালদহ জেলা প্রাচ্যের সংস্কৃতির অধিকারী বলিয়া তথাকার রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে অ-রাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের কিছু প্রভাব পড়িতে পারে এবং সেটি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। অন্যদিকে রাজবংশী সমাজের খাঁটি সংস্কৃতি মূলতঃ কোচবিহারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলা তিনটিতে তাই এখনও সকল রাজবংশীদের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের সমতা দেখা যায়। এই জেলাত্রয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং লৌকিক বিশ্বাসে তাঁহাকে শিবেরই সহযোগী বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলাতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কোন নাম বা পূজার প্রচলন দেখা যায় না।

জলপাইগুড়ি শহর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী সন্ন্যাসীকাটা হাট নামক স্থানে এই দেবতার একটি মন্দির আছে। "মন্দিরটি দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ 'প্যাগোডা'র মতন। এ মন্দির কবে কে নির্মাণ করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই,—তবে মধ্যে মধ্যে এ মন্দির সংস্কার করা হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রবাদ জুট নামক জনৈক সাহেব নাকি এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।"[১২] মন্দিরে সর্বমোট ১০টি মূর্তি আছে, সবগুলিই কাষ্ঠ-নির্মিত। তন্মধ্যে সন্ন্যাসী নামধেয় মূর্তিটি "পদ্মাসনে উপবিষ্ট। উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট। মাথায় জটা। পরিধানে বাঘের ছাল। বাম হাত ডান পায়ের পাতার উপর স্থাপিত, আর ডান হাত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে রয়েছে। মাথার জটা ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। চোখ বেশ বড় বড়।"[১৩] সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র মূর্তিও রহিয়াছে। প্রতি বুধ ও শনিবার মন্দিরে দেবতার পূজা হয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে জনসাধারণ পূজার অংশ গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবতার মত সন্ন্যাসী রাজবংশীদিগের নিজস্ব পুরোহিত দেউসি, স্থানীয় নাম 'বম্মা' এই পূজা দিয়া থাকেন। সমবেত পূজার্থীরা ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কামনা বাসনা জানায়। দুধ, চিনি, কলা ইত্যাদি সাধারণ পূজার যাবতীয় উপকরণগুলি ছাড়াও পাঁঠা মদ [illegible] অর্থাৎ কড়ি এবং মুড়ুয়ার ফুল নিবেদন করা হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীকাটার হাট বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহাকে আগেকার সন্ন্যাসী ফকীরের দল এখানে বিশ্রাম করিত। সাহিত্য সম্রাটের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে এই সন্ন্যাসীদের কাহিনী পড়িয়াই

বৃদ্ধি। কাহারও কাহারও মতে সন্ন্যাসীদের অন্যতম নেতা ভবানী পাঠকই পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী ঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন। ** কিন্তু কতকগুলি কারণে অনু এই মত সমর্থন করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করিতেছি।

প্রথমতঃ, সন্ন্যাসী ফকীরদের কার্য্যাবলী সম্পর্কে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে তাহাদিগকে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারা যায় না। সন্ন্যাসীদের দলগুলি অশ্বপৃষ্ঠে সজ্জিত হইয়া অস্ত্রধারী অবস্থায় অনুচর লইয়া সৈন্যবাহিনীর ন্যায় চলাফেরা করিত। যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা বা দান না পাইলে ইহারা কাছারী গোলাবাড়ী এবং গৃহস্থদের ঘরবাড়ী লুট করিয়া চলিত। ইহাদের অত্যাচারে বহু জমিদার কাছারীবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। ** এই জাতীয় অত্যাচারী সন্ন্যাসীদের কাহারও পূজা হইতে পারে এবং কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিঙ অবধি বিস্তৃত হইতে পারে ইহা কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসীদের নেতৃবর্গের কেহ কেহ ইংরাজদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। ** ভবানী পাঠক ইহার কিছু পরে বন্দী বা নিহত হইতে পারেন। সুতরাং আগে হইতে [illegible] হেতু শত বৎসর পূর্বে ভবানী ঠাকুরের মূর্তি পূজা আরম্ভ হইয়াছে ধরিতে হয়। কিন্তু তাহা হইবার পক্ষে যথেষ্ট সম্ভাবনা বহন করে না। কেননা এই জেলা তিনটিতে গ্রাম ঠাকুরের পূজার সঙ্গেও সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজা পাইয়া থাকেন। গ্রামঠাকুর পূজা যতখানি আধুনিক কল্পনা করা উচিত হইবে না বলিয়া মনে হয়

তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসীকাটা হাটের মন্দির নির্মাতার প্রসঙ্গে জনৈক ইংরাজের নাম জড়িত। শত্রু দলের নায়কের মূর্তি পূজা হইলে ইংরাজ যে মন্দির নির্মাণ করিবেন না তাহা সত্য। ভবানী পাঠকের আন্দোলনের বহু পূর্ব হইতেই অপরাপর সন্ন্যাসী নামধেয় দেবতাটি জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই ঐ সাহেব মন্দিরের নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

চতুর্থতঃ, সন্ন্যাসীদের দলপতি কেবল ভবানী ঠাকুরই ছিলেন না, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ প্রমুখ ? ইহারাও প্রধান শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন। অন্যান্য নেতৃবর্গকে, বিশেষতঃ দেবী চৌধুরাণীকে বাদ দিয়া কেবল ভবানী পাঠকই দেবতা হইয়া গেলেন, এই অনুমানের মধ্যে অসঙ্গতিই প্রকাশ পায়।

পঞ্চমতঃ, মন্দিরে কাষ্ঠ নির্মিত একটি নারী মূর্তিকে দেবী চৌধুরাণী বলিয়াও কল্পনা করা অনুচিত হইবে। কেননা সন্ন্যাসী ঠাকুরের পার্শ্বস্থ নারীমূর্তিটিকে স্থানীয় লোক সন্ন্যাসিনী ঠাকুরাণী বলিয়া বিশ্বাস করে। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী কল্পনা করা একান্ত ভাবে অনৈতিহাসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ভবানী পাঠক অকৃতদার কিনা জানা নাই। বিবাহিত হইলেও তাঁহার স্ত্রীর ভূমিকা কতটুকু ছিল বলা মুস্কিল, থাকিলেও পূজার যোগ্য ছিলনা বলিয়াই মনে হয়।

ষষ্ঠতঃ, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি ভবানী পাঠকই হইয়া থাকেন তাহা হইলে মূর্তির পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও মাথায় বিশাল জটা থাকিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। উপরন্তু কলকীসহ গাঁজা ও ধুতরার ফুল নিবেদন করিবারও কোন হেতু না থাকিবার কথা।

সপ্তমতঃ, সন্ন্যাসীকাটা হাটের সন্নিকটস্থ মন্দির বলিয়া দেবতাকে ভবানী পাঠকের সহিত যুক্ত করিবার প্রবণতা ইদানীং কালে দেখা দিয়েছে। অন্যত্র এই জাতীয় কোন জনশ্রুতি পাওয়া যায় না।

অষ্টমতঃ, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাবলীতে ভবানী পাঠক বা অন্য কোন সন্ন্যাসীবিশেষের নামের সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় না। মন্ত্রগুলিতে শিব হিসাবেই সন্ন্যাসীকে আবাহন এবং কামনা বাসনা জানান হইয়াছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে শিবের লৌকিক সংস্করণ বলিয়া অনুমান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। সন্ন্যাসীকাটা হাটের নামকরণের সঙ্গে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের নিহত হইবার ঘটনাটি জড়িত থাকিলেও মন্দির ও তন্মধ্যস্থ দেবতার সঙ্গে ইহার কোন সংযোগ নাই বলিয়া মনে হয়।

কোচবিহার জেলায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। মেখলীগঞ্জ মহকুমার জামালদহ নামক স্থানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দিরে একটি বিরাট মাটির মূর্তি আছে। মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দেহের বর্ণ

অঙ্গ ; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাহু ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও দুই পার্শ্বে দুইটি বেগুনী বর্ণের সাপ, মাথায় বিরাট জটা এবং কৃষ্ণবর্ণের একটি সাপ—সব সাপগুলিই উদ্যতফণা ; বাম হাত কোলের উপরে এবং অভয়বরে বরপ্রদায়িনী। বাহন ষাঁড়, সঙ্গে একটি অনুচরের মূর্তি, তাহার হাতে সর্পিকা ধরা। স্থানীয়ভাবে সন্ন্যাসীর নাম 'পাইলা কালা বাবা' বা 'পাইলা কালা শিব'। জনশ্রুতি, নিকটবর্তী দীঘিতে মূর্তির সহিত ভাসিয়া বেড়াইত। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে পূজা দেওয়া হয়, তবে মানত থাকিলে বৎসরের যে কোন দিনে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। চিড়া দই বীচিকলা দুধ ফুল ও গাঁজা উপচার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একদা রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত দেউসি পূজা করিতেন, কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মণে পূজা করিতেছেন। লৌকিক 'বিপদ-আপদ' হইতে উদ্ধার প্রভৃতি কারণের এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়।

এই জেলার চন্দনবাড়ী থানার বন্দীগঞ্জ অঞ্চলে একটি খড়ের চালাঘরের মন্দিরে ব্যাঘ্রাম্বর সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। তাঁহার কোমরে গাঁথা লেংটির মত ও বাম হাতে একটি একতারা। বৈশাখ মাসের প্রথমের দিকে যে কোন একদিন বাৎসরিক পূজা। উপচার অন্যান্য স্থানের পূজার মত। দিনহাটা থানার শিমুলবাড়ী গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুরের থানে প্রতি বৃহস্পতিবার এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন বা চৈত্র-বৈশাখের যে কোন একদিন বাৎসরিক পূজা দেওয়া হয়। মূর্তিটি মাটির, ব্যাঘ্রাম্বর ও জটাধারী, কোন বাহন নাই। দুধ কলা-চিনি-খই মুড়কি ও 'মুড়ই-মণ্ডা' প্রভৃতি পূজার নৈবেদ্য। পূজার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সময় সময় হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা থাকে। পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের দেউসি।

দার্জিলিঙ জেলার সমতল অঞ্চলে সর্বত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে। আষাঢ় মাসে ধান্যরোপণ আরম্ভ করিবার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার সময় সন্ন্যাসীর পূজা দেওয়া হয়। সাধারণ নৈবেদ্যগুলি ছাড়াও গাঁজা উপচার দেওয়া হয় সাত কাঁচ দানগুলিতে। পৃথক সম্প্রদায় অন্যান্য উদ্ভব হয় নিয়াছে যে সাধী ও মাধী নামে পূজারীরা গ্রামঠাকুরের পূজা দিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ি জেলাতেও গ্রামঠাকুরের পূজার সময় সন্ন্যাসী পূজা পাইয়া থাকেন এবং পূজা করেন অধিকারী নামীয় পূজক শ্রেণী।

বুড়াঠাকুর :—

উত্তরবঙ্গে বুড়াঠাকুরকে শিবের অংশবিশেষ স্বীকার হয়। ২৪-পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় 'বুড়োবাবা' ও 'বাবাঠাকুরের' পূজা প্রসিদ্ধ। অনেকের মতে বাবাঠাকুর শিবের অনার্যীয় বা লৌকিক সংস্করণ। কেননা, "বাংলাদেশের অস্পৃশ্য বা নিম্ন সমাজভুক্ত তাহারা হিন্দু বলে স্বীকৃত হলেও সবর্ণহিন্দুরা যুগ যুগ কোন এক কালে শাস্ত্রীয় দেবতা পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে শিবভক্তরা তাঁর পূজা শুরু করেন', তারা তাদের লোকায়ত ধারণা বা কল্পনা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় শিবের একটি অভিনব নাম ও রূপ দেয়,··· লোকসমাজে ইনি 'বাবাঠাকুর'···হয়েছেন"।[30] বুড়া বা বাবাঠাকুর পুরাণের বৃদ্ধ শিবের অনুকরণেই লোক-সমাজে সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং ক্রমশ সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত এই দেবের নাম বদলে শিবের নিরীহত্ব ও ভোলানাথত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।[31] পশ্চিমদিনাজপুরের বাজাস গ্রামে 'বাবাঠাকুর' শিব নামে পূজিত হইতেছেন।[32] রাজবংশী সমাজের বুড়াঠাকুরও শিব।[33] এই দেবতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা প্রচলিত তাহা হইল যে বুড়াঠাকুর বৃদ্ধ এবং বধির তথা প্রায় উন্মাদবৎ। শিশুদের ভয় দেখান, খালে মাছ ধরিতে গেলে খুব বিরক্ত করেন এই ঠাকুর। মাছ ধরিবার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে দেখা যায় যে আগে হইতেই সেখানে এক বৃদ্ধ বসিয়া থাকেন, নিকটে গেলে তিনি চোখের পলকে অন্তর্হিত হইয়া যান। ইহাতে চমকিয়া গেলে কিংবা ভয় পাইলে পরের দিন লোকের জ্বর আসে, বুড়াঠাকুরের পূজা দিলে জ্বর অতি সত্বর সারিয়া যায়। শিশুদের সর্দি-কাশির কারণও এই ঠাকুর এবং পূজা দিলেই সর্দি-কাশি আর থাকে না। ইঁহার পূজার বিশেষ কোন মন্ত্র নাই। যে কোন দিন পূজা দেওয়া যাইতে পারে। বাড়ী হইতে যে রাস্তা অন্য কোন বড় রাস্তায় মিশিয়াছে সেই মোড়ে একটি বাঁশ পুঁতিয়া মাথায় পাট বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সাদা পাটই বুড়াঠাকুরের মাথার চুল। বাঁশের কঞ্চিগুলিতে পুরাতন কুলা, ঢাকী, জাল ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বাঁশের গোড়ে মাটির বেদী তৈয়ারী করিয়া দুধ-কলা-চিনি বা গুড় দিয়া বুড়াঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। পূজার জন্য অধিকারীর কোন প্রয়োজন হয়না, বাড়ীর যে কেহ পূজা দিতে পারে। বাঁশের পুরাতন কুলা-ঢাকী ইত্যাদি ঝুলাইয়া দিবার কারণ হইল এই-বুড়াঠাকুর বোমভোলা মানুষ, যে কোন জিনিষ দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। বুড়াঠাকুরের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা দানের প্রচলন খুব না থাকিলেও কোথাও কোথাও মাটির মূর্তি গড়াইয়া পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার

অন্তর্গত চিত্‌লীগুড়ী গ্রামে ইহার একটি মূর্তির পাওয়া গিয়াছে। দেবতার বাহন হাতী। পাঁঠা, হাঁস, চাল, মুরগী, পায়রার মাথা মোচড় দিয়া উৎসর্গ করা হয়। এখানে বুড়াঠাকুরকে স্থানীয় গ্রামবাসী শিব-জ্ঞানেই পূজা দিয়া থাকে।

ধুমবাবা :—

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত দোমোহনী রেলষ্টেশনের এক মাইল উত্তরে কাঁঠাল-বাড়ী গ্রামে ধুমবাবা নামে এক দেবতার মন্দির আছে। স্থানীয় জনসাধারণ ধুমবাবাকে শিবঠাকুর বলিয়াই মনে করে। দেবতা এখানে প্রস্তররূপী। পাথরটি শিবলিঙ্গ সদৃশ। মন্দিরে দৈনিক পূজার ব্যবস্থা আছে। ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথি হইতে তিন দিন পর্যন্ত ধুমবাবার বাৎসরিক পূজার ব্যবস্থা করা হয়, এই সময় মেলাও বসিয়া থাকে। কাঁচা দুধ, আতপ-চাউল, কলা, চিনি, গাঁজা প্রভৃতি উপচারে দৈনিক পূজা সম্পন্ন হয়। পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন দেউসি।

স্থানীয়ভাবে জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর, নীলেশ্বর, জল্পেশ্বর, মহাকাল, মাশান, মদনকাম, বুধা, সন্ন্যাসী, বুড়া ঠাকুর, ধুমবাবা প্রভৃতি বিবিধ নামে ও নানাবিধ কারণে শিবের পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ শিবের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ক॥ শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তির জটিল ব্যাধি হইলে বামুঠাকুর বাড়ীতে দুধ, দই, চিনি, কলা, আতপ চাউল, ধুতুরার ফুল ইত্যাদি সহযোগে শিবের পূজা করা হয়। আমরা পূর্বেই শিব বিষয়ক আলোচনায় শাস্ত্র সামাজিকভাবে আলোচনা করিয়াছি যে আগুন জ্বালাইয়া দূরীকরণ ও গ্রামকে সুস্থ ও নিরাময় রাখিবার জন্য রুদ্র শিবের প্রতি প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কুষ্ঠ প্রভৃতি জটিল ব্যাধির আরোগ্যের দেবতাও শিব, তাই তিনি সর্বরোগহর।

খ॥ গ্রামবাসীর অমঙ্গলের ক্ষেত্রে, আপদ-বিপদ ইত্যাদির ফলে শারীরিক, মানসিক, ব্যক্তিগত, পরিবারগত অশান্তি দেখা দিলে 'শিব দৈবস্থান' অর্থাৎ শিব স্থাপন করা হয়। এক ছড়া কলা, দুধ, দই, চিনি, চিড়া ইত্যাদি নৈবেদ্য কলার ঢোঙা বা পাতায় দিয়া আঙ্গিনার মধ্যস্থলে দ্বিপ্রহরে বা গোধূলি লগ্নে শিবের পূজা করা হয়।

গ॥ নূতন ভিটা নির্মাণের সময় শিবপূজাদানের রীতি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে সু-প্রচলিত। নূতন বাসস্থানে কোন অশুভ অথবা ক্ষতিকারক বস্তু থাকিলে শিব পূজা করিয়া ভিটা নির্মাণ করিলে কোন বিঘ্ন দেখা দিতে পারেনা বলিয়া রাজবংশীদের প্রবল বিশ্বাস আছে।

সোনা রায় :—

শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে ব্যাঘ্র দেবতার পূজার প্রচলন প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন এবং উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের তরাই অঞ্চলেই সৃষ্টি হইয়াছিল যেখানে হিংস্র পশুর অত্যাচারে মানুষ ও গবাদি পশুর প্রভূত ক্ষতি হইত। আশ্রয়ী মানুষেরা সাধারণ অজ্ঞ লোকদের এইভাবে বুঝাইত যে বাঘের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে বিশেষ উপকরণে সন্তুষ্ট করিলে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর উপর বাঘের আক্রমণ প্রতিহত হয়।

উত্তরবঙ্গে প্রখ্যাত ব্যাঘ্র দেবতা হইলেন মহাকাল, আবার সোনা রায়ও ব্যাঘ্র দেবতা। দক্ষিণ বঙ্গের পূজিত ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়-এর সহিত ইঁহার নামের উপাধিগত মিল রহিয়াছে। এই দুই রায়-দেবতা সম্পর্কে জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলিতেছেন, "ভারতে মৌর্য রাজত্বের বহু পূর্বে বাঙলা দেশে (বা যে ভূখণ্ডকে বর্তমানে বাঙলা দেশ বলা হয় সেখানে) মিশরীয়রা আধিপত্য করতেন। মিশরীয়দের অধিকৃত বাঙলা দেশে দুটি শাসন বিভাগ ছিল – উত্তর ও দক্ষিণ। দুই অংশে দুজন মিশরীয় শাসক রাজকার্য পরিচালনা করতেন, এই শাসকদ্বয় কালক্রমে দেবায়িত হন, উত্তর বিভাগের শাসক 'সোনা রায়' ও দক্ষিণ বিভাগের অর্থাৎ বাঙলা দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের শাসক 'দক্ষিণ রায়' হন। ভারতে মিশরীয় শক্তি লুপ্ত হলেও উক্ত দুই রায়ের পূজা অব্যাহত থাকে, বর্তমানেও আছে।" সোনা রায় ও দক্ষিণ রায় নামে মিশরীয় শাসকের বিষয়টি ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা স্বীকৃত হইবে কি না বলা মুস্কিল। তবে আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষিণ রায়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন। শরৎ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিমত দক্ষিণ রায় ছিলেন ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। আসলে অরণ্যচারী মানুষের ব্যাঘ্র ভীতি হইতেই মহাকাল, দক্ষিণ রায়,

সোনা রায়, প্রভৃতি দেবতার পূজা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।** সোনা রায়কে আমরা শিব ও তাঁহার অনুসঙ্গীদের তালিকায় যুক্ত করিতেছি। কেননা, প্রথমতঃ, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অপর ব্যাঘ্র-দেবতা মহাকাল, এবং মহাকালও প্রকৃত প্রস্তাবে শিবেরই লৌকিক সংস্করণ, কিংবা লৌকিক দেবতা মহাকালই পরবর্তীকালে শিবের সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সোনারায় পূজার সময় মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা দেওয়া হয়। মূর্তিটি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে সমাসীন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাভার, সঙ্গে কোমরে সাঁজলা পেরনের কড়ী, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম এবং সর্পভূষণ, এক হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে বরাভয়। মূর্তিটি স্পষ্টতঃই শিবের মূর্তি বলিয়া প্রতীত হওয়া স্বাভাবিক।** তৃতীয়তঃ, সোনারায় ঠাকুরের পূজা শিবচতুর্দশী তিথির দিনে হইয়া থাকে। তাহে কাজেই সোনারায়কে শিবের অনুসঙ্গীরূপে বর্ণনা করিবার সাহস আমরা পাইয়াছি।

সোনারায় ঠাকুরের পূজায় সোনারায় ব্যতীত অন্য একটি দেবতার মূর্তিও থাকে। তাঁহার নাম রূপারায় অর্থাৎ রূপারায়। রাজবংশীদের ধারণায় রূপারায় ও সোনারায় পরস্পর সহোদর, কিংবা রূপারায় সোনারায়ের পার্শ্বচর বিশেষ।

পূজার পূর্বে সপ্তাহাধিক কাল হইতে পূজার ব্যয় নির্বাহার্থ একটি দল গান গাহিয়া গ্রামে বাড়ী বাড়ী মাগনে বাহির হয়। এই সময় দলটিতে পাটের আঁশ ও সোলার ফুল সজ্জিত একটি বাঁশদণ্ড, একটি চামর এবং এক ঘটি দুগ্ধ-মিশ্রিত জল ও ফুল থাকে। মাগনে বাহির হইয়া কোন বাড়ীতে উপনীত হইয়া গাওয়া হয়—

"সোনারায়ের দক্ষিণা লাগে পূর্ণ কুলাখান,
তাহার উপরে লাগে জোড় গুয়াপান।"

যাহারা দক্ষিণা দেয় গায়কের দল তাহাদের জন্য ঘটি হইতে দুগ্ধ-মিশ্রিত জল ও ফুলের আশীর্বাদ দান করে। এই সময়ের একটি গান গাওয়া হয়। গানটিতে সোনারায় ঠাকুরের পূজার কারণ পাওয়া যায়—

"সত্য ঠাকুর সোনা রায় গৃহস্থক দে তুই বর,
মনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাকর।
গাইলে বাড়ুক গাইগরু সোনার বাড়ুক ধান,
লেওয়ানে দেওয়ানে পাইক বাটোয়ারা পান।
গাইলে বাড়ুক গাইগরু আঙ্গিনে বাড়ুক মাটি,
গিরিঘরের শত্রু উষমং বনের বাঘে খাউক।"

সোনারায়ের পালাগানগুলিতে মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যাইতে পারে যে এতদঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর পালাগানগুলি রচিত হইয়াছে। তবে মুসলমান আক্রমণের বহুপূর্বেই সোনারায় ঠাকুরের পূজার সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে।

খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা বলিয়াছেন, "মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্বে কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় দুইজন ধর্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গড় বা পাট এ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সোনারায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কতকটা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ।** সোনারায় ধর্ম সংস্কারক হইলেও বুদ্ধের উপাসক কিনা বলা মুস্কিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের সহিত গানগুলিতে সোনারায়ের জন্মবৃত্তান্তের সাদৃশ্যবশতঃ ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন," বৈকুণ্ঠে বাস করেন— লক্ষ্মীনারায়ণ তথা বিষ্ণু। লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ সমার্থতঃ এক তথাপি ভাবনায় ভিন্ন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মতে রাধাকৃষ্ণ গোলকবিহারী। কিন্তু ভাগবত বৈষ্ণবের ভাবনায় লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠবিহারী। পদাবলী সাহিত্যের 'কানু' বা কৃষ্ণই হইতেছেন বিষ্ণুর অবতার। তবে কি বিষ্ণু—কৃষ্ণ সোনারায় হইয়াছে?"** অথচ তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন "সোনারায় বেদোক্ত দেবতা নহেন লৌকিক দেবতা।"** সুতরাং সোনারায়কে লৌকিক দেবতা হিসাবেই গ্রহণ করা সমীচিন হইবে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের সহিত যে সাদৃশ্য রহিয়াছে বা লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের সংযোজনাও হইতে পারে। আসলে সোনারায় ব্যাঘ্রদেবতা এবং তাঁহার সহিত বাংলার সুন্দরবনের দেবতা দক্ষিণ রায় এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের দেবতা মহাকালের সম্পর্ক থাকিতে পারে।

গমীরা ও চড়ক :—

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ জেলাতে যাহা গমীরাঠাকুর পূজা এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট উৎসব ক্রিয়ার মেলা ও গান তাহাই মুখ্যতঃ মালদহ ও আংশিকভাবে পশ্চিমদিনাজপুর জেলাতে

গমীরা গমীরোৎসব। উভয় ক্ষেত্রেই উপাস্য দেবতা শিব এবং উভয় অংশেই চড়ক একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। এই গমীরাঠাকুর পূজা, ভক্তিয়ার খেলা ও গান এবং চড়ক সবগুলিই আবার রাজবংশীদের হিন্দু পর্বের সহিত সাদৃশ্য।

চৈত্র সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে লোকালয় হইতে দূরে গমীরাঠাকুরের পূজা মণ্ডপ তৈয়ারী করা হয়। ... মাটির একটি শিব মূর্তি গমীরাঠাকুর রূপে পূজিত হইয়া থাকে। পূজক রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ বা দেওধামী, তাঁহাকে পূজায় সহায়তা করে যাহারা তাহাদিগকে বলা হয় সন্যাসী বা ভক্ত্যা। গমীরা ঠাকুরের পূজা স্থাপনের পরদিন হইতে শেষ পূজার পূর্বদিন অবধি সন্যাসী বা ভক্ত্যাগণ বাড়ী বাড়ী গান গাহিয়া এবং সেই সঙ্গে নানা প্রকারের কসরৎ দেখাইয়া চাউল পয়সা সংগ্রহ করে। ভক্ত্যাদের মধ্যে একজন শিব ও গৌরী এবং দুই-তিনজন নর্তকী সাজিয়া গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। এই গানের স্থানীয় নাম গমীরা ঠাকুরের গান বা ভক্তিয়ার গান[৫]। সম্ভবতঃ ভক্ত্যার গান শব্দটিই অপভ্রংশ হইয়া ভক্তিয়ার গান হইয়াছে।

গমীরা ঠাকুরের পূজার মুখ্য অঙ্গ আকাশচাউল বই দিয়া তৈরি ... মুখা ... ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পূজা মাসের শেষ দিনে ... এবং কাষ্ঠনির্মিত গৌরীপাট স্থাপন করা হয়। গৌরীপাটটি দেখিতে অনেকটা নৌকার মত। ইহা দুই-আড়াই হাত, মাথার দিকে একাকৃতি এবং মধ্যস্থলে কালীমূর্তি অঙ্কিত। ... সহিত বেষ্টন করিয়া রাখা হয়। গৌরীপাট ও ত্রিশূল স্থাপনের পূর্বে দেওধামী স্নান করাইয়া তেল-সিঁদুর দিয়া ... সহকারে ... মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করান হয়। এইরূপ গ্রামের ... বলা হয়। মণ্ডপ প্রদক্ষিণের সময় দেউনির মস্তকে গৌরীপাট, সহায়ক কোন সন্যাসীর হাতে ত্রিশূল থাকে এবং পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট ভক্ত সাধারণ তাহাদের অনুসরণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির ৪ দিন পূর্বে হইলে ৩ দিনের, ৮ দিন পূর্বে হইলে ৫ দিনের এবং ৮ দিন পূর্বে হইলে ৭ দিনের ... দেউনি ঘট বা ঘট স্থাপন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দিনের পূজার জন্য মোট ৪টি ঘট বা কলস প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে শিব ও দুর্গার জন্য ২টি, শ্মশানপূজার জন্য ১টি, চড়কের গাছের জন্য ১টি এবং ... পূজার জন্য ১টি। পূজা স্থাপনের পর বন্দনাগীত গাওয়া হয়। বন্দনাগীত আসলে মন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। মহাস্নান, ঘট স্থাপন ও ... প্রভৃতির পর পুনরায় গমীরা ঠাকুরের পূজা। এই সময় মদ, গাঁজা, ধুতুরার ফল ও ফুল, বেলপাতা, কলা, চিঁড়া, আকন্দ, সময়োচিত ফলমূল ইত্যাদি উপচার হিসাবে প্রয়োগ হয়। ধূপধূনার ব্যবহারের বিশেষ আছে। ইহার পর ভক্ত্যাদের 'খেলা'। নানাবিধ দৈহিক কসরৎ নির্বাচিত ভক্ত্যারা দেখাইয়া থাকে। এই খেলা দেখিবার জন্য মণ্ডপের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহুলোক আসিয়া থাকে। দিনের শেষে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। সন্ধ্যারতির পূর্বে দেউনি তাঁহার মন্ত্রপূত জল ভক্ত্যাদের দেহে ছিটাইয়া দিলে তাহাদের ভর উঠে। ভরগ্রস্ত অবস্থায় ভক্ত্যারা আরাত্রিক করিতে থাকে। এই আরাত্রিক বহুক্ষণ ধরিয়া চলে। সন্ধ্যারতির সময়ের নির্দিষ্ট বন্দনা গীত গাওয়া হয়। শেষ হইবার সময় ভক্ত্যাগণ ধুপদানী মাথায় করিয়া মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের কালেও আর একটি মন্ত্র বা বন্দনা গান গাওয়া হয়।''

দ্বিতীয় দিনের সকালের দিকে গৌরীপাট ও ত্রিশূলের মহাস্নানের মধ্য দিয়া পূজার আরম্ভ। পূজার ক্রম ও উপচার প্রথম দিনের মত। এই দিন সারাদিন আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না। তাই এই অবসরে ভক্ত্যাগণ বাড়ী বাড়ী গান গাহিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় শ্মশানে বার দেবতার পূজা, ইহার স্থানীয় নাম 'হাজরা' পূজা। যে বারজন দেবতা হাজরা পূজায় পূজা পাইয়া থাকেন তাঁহারা হইলেন—(১) শিব, (২) গৌরী, (৩) সাজি, (৪) ডাকিনী, (৫) যকিনী (সম্ভবতঃ যোগিনীর অপভ্রংশ) (৬) মাশান, (৭) ভূত, (৮) চিতাবুড়ী, (৯) বিষহরি, (১০) কুচুনী, (১১) অপদেবতা, (১২) কালী। পূজায় পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, চাউল চিঁড়া, চালভাজা, ..., মুড়ি, খই, তিন বা পাঁচ প্রকারের মাছের পোড়া, লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপকরণের প্রয়োজন হয় এবং পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই পূজার প্রধানতম উপচার মৃত মানুষের ৫টি মাথার খুলি। খুলিগুলিকে গঙ্গাজল বা শ্মশানের নিকটস্থ নদী বা পুকুরের জলে স্নান করাইয়া পবিত্র তৈল সহ সিঁদুর লিপ্ত করা হয়। এখানেও দেউনি নির্দিষ্ট ভক্ত্যাদের ভর তুলেন এবং তাহারা নানা প্রকারের দৈহিক কসরৎ দেখাইয়া থাকে। ইহার নাম শ্মশান খেলা। খেলা শেষ হইলে খুলিগুলিকে ঐ স্থানে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। খুলির একান্ত অভাব হইলে বিকল্পরূপে বিষফল দ্বারাও কাজ চালান যাইতে পারে। শ্মশান খেলার সময় শ্মশান কালী ও চামুণ্ডাকালীর মুখা পরিয়া দুইজন ভক্ত্যা ভরগ্রস্ত অবস্থায় মুখানৃত্য পরিবেশন করে।

তৃতীয় দিনের ভক্তিয়ার খেলা ও গান। তিন দিনের সংকল্প লইলে চতুর্থ দিনে, পাঁচ দিনের সংকল্প লইলে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে খেলা ও গান এবং ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিনে চড়ক। চড়কের পূর্বের এই দিনগুলিতে ভক্তাগণ গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়, দেউসি অর্থাৎ মূল পুরোহিত মণ্ডপে থাকেন এবং সকাল, দ্বিপ্রহরে যথাবিহিত পূজা সম্পাদন করেন। সন্ধ্যায় ভক্তাগণ মণ্ডপে ফিরিয়া আসিলে বন্দনা গান গাওয়া হয় এবং সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করা হয়।

শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিনের শেষ কৃত্যটি চড়ক অনুষ্ঠান। এইদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জনসাধারণ পূজা মণ্ডপে আসে, ফলে একটি মেলার সৃষ্টি হয়। চড়ক খেলার বন্দোবস্ত গম্ভীরা ঠাকুরের পূজা মণ্ডপের সম্মুখেই করা হইয়া থাকে। একটি সজীব শিমুল গাছ কাটিয়া মণ্ডপের সম্মুখে কয়েক হাত দূরে পূজা করিয়া সেটিকে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। পূজার সময় একটি সাদা পায়রা জীবন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাছটিতে তৈল সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয় এবং একটি আম্র পল্লব লাল গামছা বা লাল শালু কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। গাছের মাথার দিকে আড়াআড়িভাবে একটি বাঁশ বাঁধান থাকে। বাঁশটির একটি প্রান্তে দড়ি লাগাইয়া গাছের গোড়ায় আটকানো থাকে। উহার অপর প্রান্তটিতে দড়িতে একটি বড় বড়শী ঝুলাইয়া দেওয়া থাকে। যে লোকটিকে চড়কে ঘুরান হইবে তাহার পিঠে বড়শীটি ফুটাইয়া দিতে হয়। লোকটিকে বড়শীবিদ্ধ করিবার কালে তাহার হাতে একটি জীবন্ত পায়রা দিতে হয়, সে উহার মাথাটি ছিঁড়িয়া রক্তপান করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। বাঁশটির অপর প্রান্তের দড়ি ধরিয়া বড়শীবিদ্ধ লোকটিকে ,৫ বা ৭ বার ঘুরাইয়া বড়শীযুক্ত তাহাকে নামাইয়া আনা হয়। উক্ত অবস্থায় সে মেলার লোকদের নিকট হইতে পয়সা সংগ্রহ করে। অন্যান্য ভক্তাগণও এই সময় কেহ জিহ্বায় সুঁচ ফুটাইয়া, কেহ বাঁটার ধারে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে এবং পয়সা সংগ্রহ করে। এই সমস্ত ব্যাপারকে বলা হয় বাণ-ফোঁড়া। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরের জন্য গম্ভীরা ঠাকুর পূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট চড়ক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গম্ভীরা ঠাকুরের পূজা স্থাপনের দিন হইতে চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্যন্ত দেউসি ও ভক্তারা পূজা মণ্ডপ হইতে নিজেদের বাড়ী আসিতে পারেন না, তাঁহারা সকলে পূজা মণ্ডপে বাস করেন এবং আহারাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই কয়েকটি দিনে ভক্তাদের জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট আছে—তাহারা দেহে বা মাথায় তৈল ব্যবহার, আমিষজাতীয় কোন পদার্থ এবং আলু, কলা, ডাল সিদ্ধ ও আতপ চাউলের ভাত ব্যতিরেকে অন্য কোন চাউল বা তরিতরকারী আহার করিতে পারে না। চড়ক পূজার দিন দেউসি ও সমস্ত ভক্ত্যাগণকে নিরাহারে থাকিতে হয়। অতএব আহারে বিহারে, দেহে মনে এই কয়েকটি দিন তাহাদিগকে কঠোর সংযম পালন করিতে হয়।

আমাদের আলোচনার মধ্যে সম্ভবতঃ প্রকাশ পাইয়াছে যে গম্ভীরা ঠাকুরের পূজাটি মূলতঃ শিবোপাসনা। সুতরাং হয় শিবই স্থানীয় ভাবে গম্ভীরা ঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়াছেন, নতুবা গম্ভীরা ঠাকুরই পরবর্তীকালে শিবের আধারে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে পরিণত হইয়াছেন। গম্ভীরা শব্দটি যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া গমীরা নামে সহজীকৃত হইয়াছে,** না গমীরা শব্দটিই পরবর্তীকালে সংস্কারিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হইয়া গম্ভীরা নামে অলংকৃত হইয়াছে তাহা বলা মুস্কিল। কিন্তু বাঙলা তথা বাঙালী সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ যতই গভীরে প্রবেশ করিতেছে ততই যেহেতু আমরা বুঝিতে ও জানিতে পারিতেছি যে আমাদের জন-জীবন ও ধর্মকর্ম সাধনার ভিত্তিটি প্রাগার্য তথা আর্যেতর অনেক আদিবাসীর দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে,** সেইহেতু ইহা অনুমান করা একান্তভাবে অসঙ্গত না হইতেও পারে যে গমীরা শব্দটিই গম্ভীরায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কেননা গম্ভীরা উৎসবের মুখ্য কেন্দ্রস্থল মালদহের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোক মুখে এই শব্দটির বেশী পরিচিত ও প্রচলিত। শিক্ষার ও বিস্তার, শহরের সহিত যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতা, আধুনিকতার প্রভাব এবং সর্বোপরি সকল কিছুর মধ্যেই আর্যীকরণের প্রবণতা প্রভৃতি কারণ বশতঃ শিষ্ট গম্ভীরা শব্দটি এত প্রচার লাভ করিয়াছে যে গমীরা শব্দটি অশিষ্টবৎ হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদপ্রসঙ্গে বাংলা দেশের বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্যটি আমাদের অনুমানের অনুকূলে। তিনি বলিতেছেন "গমীরা শব্দটির সঙ্গে গম্ভীরা শব্দের যে কোন না কোন ভাবে যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উত্তর বাংলার লোক সংস্কৃতির উপকরণ সাধারণতঃ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শৈব ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গমীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় পরিণত হইয়া থাকিবে, গম্ভীরা শব্দ হইতে গমীরার উৎপত্তি হয়

নাই, তাহা সত্য" ** 'আদ্যের গম্ভীরা'-কার নিঃদ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ সংকলনকালে এই পূজা উৎসবকে কোচ-পলিয়া প্রভৃতি সমাজের কৃত্য বলিয়া লোকে ঘৃণা করিত **। এই কোচ-পলিয়ারা মূলতঃ যে রাজবংশী তাহা ভূমিকায় আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। রাজবংশী সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতি মূলতঃ কোচবিহারকেন্দ্রিক। ফলতঃ এই জাতীয় একটি সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া পারা যাইতেছে না যে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চলের গমীরা ঠাকুরের পূজাই গৌড়ের সংস্কৃতির সহিত সমন্বিত হইবার বাসনায় গম্ভীরা নাম লইয়া অভিজাত্য প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছে। কেননা, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেবগৃহ অর্থে এবং শিব সংহিতায় শিবের বিশিষ্ট বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ থাকিলেও গম্ভীরা শব্দটির অর্বাচীনত্ব ঘুচান যায়না। প্রথম গ্রন্থ দুইটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা ** এবং তৃতীয়টিও অত্যন্ত সুপ্রাচীন কালের রচিত নহে। উপরন্তু গ্রন্থের ভক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় স্পষ্টতঃই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে দেবগৃহ বা শিব অর্থে গম্ভীরা "প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়না।" **

যাহাই হউক গমীরা ঠাকুর প্রকৃত প্রস্তাবে শিব ঠাকুর, কেননা পূজার সময় যে মাটির মূর্তিটি তৈয়ারী করা হয় তাহা শিবেরই মূর্তি। মহাস্নানে ত্রিশূলের ব্যবহার, উপাচার হিসাবে গাঁজা ধুতুরা আদের প্রয়োগ, কুশিয়ার গানে শিব-দুর্গার সজ্জা এবং প্রভৃতি প্রমাণও শিবের অনুকূলে। উপরন্তু গাজনের ন্যায় শিবপ্রীতির জন্যই গমীরা পূজায় চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। "গাজনের প্রধানতম অঙ্গ চড়ক পূজা। আকাশ পথে সূর্যের বৃত্তাকার ভ্রমণের অনুকরণে চড়ক ঘোরে। একদা সূর্য সাদৃশ্য লাভের বাসনায় আদিম মানুষ ঘুরত চড়কে; আজ শিবের নামোচ্চারণ করে তাঁর প্রীতি কামনায় ভক্তরা চড়কে ওঠে" ** চড়কের সঙ্গে সংযুক্ত বাণ-ফোঁড়ার বিষয়টিকেও বিখ্যাত 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস পালিত মহাশয় 'শিবপ্রীতি' কামনা বলিতে চাহিয়াছেন। এতদ প্রসঙ্গে ধর্মসংহিতার কাহিনী সম্বলিত তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উদ্ধৃতি যোগ্য :—

> উষা ও অনিরুদ্ধের ব্যাপার লইয়া শোণিতপুরাধিপতি বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বাণ ছিন্নবাহু, বাণবিদ্ধ এবং শোণিতাপ্লুতদেহ লইয়া শিবসকাশে নৃত্য করিয়াছিলেন।... বাণ শিবভক্তগণেরও জন্য একটি বর প্রার্থনা করেন :—
>
> "দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও দুঃখার্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে"। মহাদেব বলিলেন, "বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইবে"।
>
> এই...ব্যাপোপাখ্যান হইতে সন্ন্যাসিগণ শিবপ্রীত্যর্থে বাণ বিদ্ধ শোণিতাপ্লুত দেহে শিবসকাশে নৃত্য করে। মনে হয় বাণরাজা ইহার পথ প্রদর্শক বলিয়া তাঁহার নামে এই উৎসবের নাম "বাণফোঁড়া" হইয়াছে।**

সুতরাং সমস্তদিক বিচার, বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলে গমীরাঠাকুর পূজা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে শিবো-পাসনাই বলিতে হইবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিব কৃষিদেবতা। গমীরাঠাকুরের পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ চড়কের সঙ্গেও কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা ইহাতে, "মাটিতে দণ্ড পুঁতে শস্যক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌনাচার অভিনীত ও দেবদেবীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থানে উত্থিত দণ্ডটিকে পুরুষ ও শায়িত দণ্ডটিকে স্ত্রী ('বাবা আদম' ও 'মা আদম') কল্পনা করা হয়। চড়কের ঘূর্ণী সূর্য ও পৃথিবীর যৌন মিলনকে দ্যোতিত করে; চড়ক গাছ তখন লিঙ্গোপম; উভয়ের মিলনে শস্যরূপ নবজাতকের জন্ম সম্ভাবনার কল্পনা প্রকাশ করা হয়"।**

এতদসহ গমীরাঠাকুর পূজার দ্বিতীয় দিনের শ্মশানে ছাগল পূজার ব্যাপারটিও লক্ষণীয়। এখানে বাহুজন দেবতার উদ্দেশ্যে মদ এবং অন্যতম উপকরণ হিসাবে ৭টি মানুষ খুলির ব্যবহারের বিষয়টি তন্ত্রাচারের একটি ক্ষীণ স্মৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ-মকারের একটি বিশিষ্ট উপাদান মদ, আবার শবসাধনায় সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত মানুষ খুলির ব্যবহার। উপরন্তু ধর্মসংহিতার কাহিনীর সহিত যেমন বাণ ফোঁড়ার যোগাযোগ থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমনই ইহার এবং কুশিয়ার খেলায় নানা রকম অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ও নৃত্যের সহিত যাদুবিশ্বাসের জটিলতা থাকাও বিচিত্র নহে। আর এই যাদুবিশ্বাসের মূল কারণটিও সম্ভবতঃ ধর্মসংহিতা বর্ণিত 'শিবপ্রীতি কামনা'।

নির্দেশ তালিকা :—

১। শ্রীনীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ; উইলিয়াম ক্রুক ; অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য ; অধ্যাপক চুইটনী ; কে, এ, পানিককর প্রমুখ।

২। আমাদের পরিচয়—ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত (১৯৪১), পৃঃ—৮০

৩। দ্রঃ—ক) বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ—১০৭
খ) বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৮০-৮২

৪। গ্রাম্য সাহিত্য/রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (১৩৪৭), পৃঃ—৬৬৮
তুলনীয়—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯৪০), পৃঃ—২৬-২৭

৫। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৪৯

৬। Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—P. C. Bagchi, 1929, cal.

৭। দ্রঃ—বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৭৪

৮। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা—শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত, (১৯৬১), পৃঃ—২১২

৯। জল্পেশ মহাপীঠ—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্মন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ—৩৮

১০। জল্পীশ মহাপীঠের ইতিহাস—শ্রীবসন্ত চন্দ্র ভট্টাচার্য (গোবিন্দ শঙ্কর সর্বাধ্যক্ষ লিখিত মূল গ্রন্থের অনুবাদ, ১৩৬০), পৃঃ—২৮

১১। রাজত্বকাল—১৬৩২ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ

১২। রাজত্বকাল—১৬৬৫ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ

১৩। ময়নাগুড়ি থানার পেটকাটি মন্দিরের আবিষ্কার সম্পর্কেও অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আমাদের গোয়ালপাড়া জেলার ট্রক্রেশ্বরীর মন্দির এবং নন্দেশ্বর দেবালয় সম্পর্কেও গাভীর দুগ্ধক্ষরণের কাহিনী সুপ্রচলিত। দ্রঃ—বহুপীঠের একুশটী—শ্রীঅম্বিকা চরণ চক্রবর্তী, ১ম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃঃ—২৬,৩৬

১৪। দ্রঃ—কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ—৭৯, পাদটীকা ১০। আমাদের বক্তব্য—বিশ্বসিংহ আনুমানিক ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হন। মন্দির নির্মিত হইয়াছিল মহারাজ মোদনারায়ণের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬৬৫ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং এমনও হইতে পারে যে জল্পেশ মন্দিরে অতীতে কেবল একটি থান ছিল এবং তাহাতে মেচ্‌ বা কোচিয়া জাতীয় পূজারীর দ্বারা পূজা দেওয়া হইত। এই থানটির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে হীরাদেবী সেখানে পুত্র কামনা জানাইয়াছিলেন।

১৫। দ্রঃ জল্পেশ মহাপীঠের ইতিহাস, পৃঃ—৫

১৬। জলপাইগুড়ী জেলার ইতিহাস—ডঃ রেবতী মোহন লাহিড়ী (জলপাইগুড়ী জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭০), পৃঃ—৭

১৭। দ্রঃ—Survey and Settlement of the Western Duars in the District of Jalpaiguri—Page—95

১৮। Pages—149-50

১৯। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, পৃঃ—২১১-১২ হইতে উদ্ধৃত।

২০। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৭৪

২১। বর্তমান পুরোহিত শ্রীনরেশ চন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। বয়স-৭৭

২২। "কাহারও কাহারও মতে শিব শ্মশানে থাকেন বলিয়া উঁহার অপর নাম 'মশান' হইয়াছে। আবার কাহার কাহার মতে মশান শিবের অনুচর উপদেবতা বিশেষ"। —পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, ১ম খণ্ড, পৃঃ—১৭৯

২৩। The Rajbanshis of North Bengal, Page—162

২৪। হাঁরামনি—মহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ১৯৪২, পৃঃ—ভূমিকা-১৷৷

২৫। ঐ, পৃঃ—১৷৷৵

২৬। The Rajbanshis of North Bengal, Page—138

২৭। হারামনি, ভূমিকা, পৃঃ—১৷৷৴

২৮। অমর—শ্রীকবীপাল সম্পাদিত

২৯। ঐ

৩০। বাংলার ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪০।

৩১। বাঙ্গলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ—১০৪

৩২। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা, ১ম খণ্ড, পৃঃ—১৪৪

৩৩। জলপাইগুড়ীর দেব-দেবী—শ্রীধীরেন্দ্র প্রসাদ বসু, (জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ) পৃঃ—১০৮

৩৪। ঐ, পৃঃ—১৪৯

৩৫। দ্রঃ—ক) জলপাইগুড়ীর দেব-দেবী, খ) শারদীয় জনমত, ১৩৭০, সন্ন্যাসী—শ্রীনিখিল ঘটক।

৩৬। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস—ডঃ রেবতী মোহন লাহিড়ী, পৃঃ—১২

৩৭। দ্রঃ—ঐ, পৃঃ—১৬

৩৮। বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ—৩৭

৩৯। দ্রঃ—বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—১১৪

৪০। দ্রঃ—পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, ১ম খণ্ড, পৃঃ—১১০

৪১। দ্রঃ—বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৭৭

৪২। The Tiger God in Bengal Art—Modern Review, Nov., 1932

৪৩। শ্রীসুধাংশু রায় মহাশয়ের অভিমত। দ্রঃ—বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ—১৫৩

৪৪। Journal of Royal Asiatic Society of Bengal—Vol XVI, 1950, Page—210

৪৫। Hindusthan Review, Allahabad, January, 1923, Pages 167-71

৪৬। দ্রঃ—A. The Tiger Cult and its Literature in Lower Bengal—Asutosh Bhattacharjee—(*Man in India, XXVII, 1917*), Pages—44-50

B. বাঙ্গলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস

C. বাংলার লৌকিক দেবতা

৪৭। শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "সোনা রায় ঠাকুরের পূজায় কোন মূর্তি নাই"। —সোনা রায়ের গান, ধুবড়ী, ১৩৪০, ভূমিকা। তথাপি সঠিক নহে।

৪৮। কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ—৬০

৪৯। সোনা রায়ের গান, পৃঃ—১৵ (ভূমিকা)

৫০। ঐ, ১৵/ (ভূমিকা)।

৫১। প্রথম দিনটিকে কোথাও কোথাও জাগরণের দিন বলা হইয়া থাকে এবং রাত্রে মুখানৃত্য ও পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

৫২। বাংলার পল্লীগীতি—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ—২৩

৫৩। দ্রঃ—বাঙ্গালীর ইতিহাস

৫৪। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর :—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, (১ম সং, ১৩৭৩), পৃঃ—৬৪০

৫৫। আদ্যের গম্ভীরা—শ্রীহরিদাস পালিত, ১৩১৯, পৃঃ—প (উপক্রমণিকা)

৫৬। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে ১৭শ শতকের ১ম দশকে চৈতন্যচন্দ্রিকামৃত রচিত হইয়াছে। দ্রঃ—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ—৩৪৩ ১৭শ শতকের পূর্বে লিখিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত নাম গ্রন্থের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। দ্রঃ—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ—২২৭

৫৭। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ—১১২

৫৮। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৭৬

৫৯। পৃঃ—৩০৮

৬০। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ—৫৬